দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীমুক্তি ও নারীর অধিকার বিষয়ে রবীন্দ্র পূর্ববর্তী চিন্তা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই পরিবর্তনের ফলকে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিককালে অনেক ঐতিহাসিক এই পরিবর্তনকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।[১] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনা করলে পরিবর্তনের গুরুত্ব বোঝা যায়। ১৭৬০ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে মধ্যযুগের সমাপ্তি বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ তার পরপরই আধুনিক যুগ শুরু হয়ে গেছে এমন দাবী কেউ করবে না। যথার্থ আধুনিকতার সূচনা হয়েছে আরো অনেক পরে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ কালেই এসেছেন রামমোহন রায়।"[২] এ যুগের সমালোচকের মতে, বাঙালি জাতিকে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক যুগের মহাকাশে উড়তে শিখিয়েছেন রামমোহন রায়।[৩] রামমোহন রায়ের সময় থেকেই সামাজিক পরিবর্তনগুলো স্পষ্ট রূপ পেতে থাকে। এর আগে পর্যন্ত সামাজিক অবস্থার বিশেষত স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থান কেমন ছিল তার কিছুটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

উনিশ শতকের সূচনায় বিশেষ করে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার অবনমন ঘটেছিল তা নয়।[৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা দেশের হিন্দু সমাজ মধ্যযুগীয় নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য লোকাচার এই সমাজকে এক বিশাল অচলায়তনে পরিণত করেছিল। এই অবস্থায় মনের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, ন্যায় ও বিবেক-বোধ সুপ্ত ছিল, ধর্ম শুধু আচার নিষ্ঠায় পর্যবসিত হয়েছিল।[৫] সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর। "In ancient Bengal, as in the rest of India, a woman had hardly any independent legal or social status, except as a member of the family of her father and husband. ... The prevalance of polyganny must have made their lives at home some what irksome. .. The position of the wodows in Society was not at all enviable. They were often looked upon as inauspicious and were very seldom allowed to take part in the different rites and ceremonies. They seem to have been encouraged by the people to immolate themselves in the funeral pyres of their husbands."[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে ছিল কৌলীন্য প্রথা। এটা প্রথমে ব্রাহ্মণ্য সমাজেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ প্রভৃতি সমাজেও প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্য প্রথা ছিল কন্যাগত। অকুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের কৌলীন্য ভঙ্গ হত, এবং সমাজে তাকে হীন মনে করা হত। কুল রক্ষার জন্য কুলীন পিতাকে যে ভাবেই হোক কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কুল রক্ষা করতে হত ।[৭] এর ফল কি হত শোনা যাক প্রসন্নময়ী দেবীর 'আত্মকথা' থেকে ঃ "আমাদের আসমুদ্র বারেন্দ্র সমাজ কোথায় কাশী আর কোথায় বিক্রমপুর, মৈমনসিং, রাজশাহী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে ভরপুর, তবু সে সমাজে কুলীন পাত্র পাওয়া বড় কঠিন ছিল, তাহাতেই জমিদারী লিখিয়া দিয়া, বহু অর্থ ব্যয়ে কুলীনে কন্যাদান করিতে হইত। আমার পূর্ব্বপুরুষরাও এই কুলীনে কন্যাদান করিতে প্রায় সর্বস্বান্ত হন।[৮]" কুলীন ব্রাহ্মণরা অগুনতি বিয়ে

করে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফেলে রেখে দিত। বহুবিবাহের ফলে সামাজিক অবক্ষয় কোথায় পৌঁছেছিল তার অনেক বিবরণ আছে সে সময়কার সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায়।[৯]

নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে রামমোহনের নাম সবার আগে এলেও এবং আধুনিকতার প্রধান পুরুষ হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা হলেও মনে রাখতে হবে কলকাতার ধনী হিন্দুরা এবং কিছু হিতৈষী ইংরেজ ও খ্রীষ্টান মিশনারী এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই চেষ্টার ফল হিসেবে ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এই কলেজের ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা আছে। রামমোহন রায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় না নিলে সে সময়ের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইয়াং বেঙ্গল এবং হিন্দু কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ The Hindu College in its uncompromising modernity became the controlling force of the new movement, and its record thus possesses a peculiar interest and inportance in the early history of western education in Bengal, its failures and successes being equally instructive ... Young Bengal wanted to see the world from a new angle, this attitude was prompted, not by mad spirit of iconoclasm, but by their impatience with false notion, absured practices and conventional restrains, from which they strove to free themselves even at the cost of alienation from deep rooted national sentiments and traditions. In this way however blundering the way might have been, mediaeval Bengal was being transformed into modern Bengal.[১০] সমাজ সংস্কার নারীমুক্তি স্ত্রীশিক্ষা সহ অন্যান্য কর্মকান্ডে এই কলেজের ছাত্ররা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে সমাজ সংস্কার কে কেন্দ্র করে তিনটি প্রধান দল তৈরি হয়েছিল। রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, মতিলাল শীল প্রমুখরা ছিলেন রক্ষণশীল দল। এঁদের প্রধান সংগঠন ছিল ধর্মসভা (১৮৩০) এবং প্রধান মুখপাত্র ছিল সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২)। ইংরেজী শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এঁরা কিছু সুযোগ সুবিধা পেতে চেয়েছেন ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যে উদার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা এঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। এঁরা সংস্কারমূলক আন্দোলনের বিরোধিতাই করে গেছেন। দ্বিতীয় দলটি ইয়াং বেঙ্গল সম্প্রদায়। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিও-র ছাত্র এই যুবকেরা বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' এঁদের মুখপাত্র ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ''অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতেছি ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।''[১১] ইয়ং বেঙ্গলরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্তন চাইতেন এঁরা। ইয়ং বেঙ্গলদের সমালোচনা করে বলা হয় এরা 'সমাজচ্যুত' গোষ্ঠী। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিল্প- সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সেই সময়কার হিন্দু সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে এদেশে সুসভ্য সমাজ গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরাও এক ধরনের 'ইউটোপীয়ান'। তবে এঁদের সম্পর্কে একথাও বলা হয়ে থাকে যে

হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার সমূহের সম্পূর্ণ উর্ধে উঠে ধর্মকে সংস্কার আন্দোলনের সাথে মিশিয়ে না ফেলে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি ব্যাপারে আন্দোলনের এক নতুন ধারা তাঁরাই প্রবর্তন করেছিলেন। নারীমুক্তি আন্দোলোনের ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিশেষত স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে এবং পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে। তৃতীয় যে দলটি ছিল তাঁরা আগের দুটি দলের সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁদের মতো স্থিতধী সমাজ সংস্কারকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সমন্বয় সাধন করে এ দেশের উপযোগী নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এঁদের চেষ্টাই সব থেকে ফলপ্রসূ হয়।[১৪]

রামমোহন রায় ১৮১৪ সালে কলকাতা এসে বসবাস শুরু করার পর থেকে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ পেতে শুরু করে। সতীদাহ প্রথা রদ করাই তাঁর সর্বপ্রধান সমাজ সংস্কারমূলক কাজ হলেও এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। স্ত্রী শিক্ষা বাংলা গদ্যের সংস্কার, বিজ্ঞানের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি নিয়েও তিনি ভেবেছিলেন এবং তারজন্যে অনেক শ্রম স্বীকার করেছিলেন।[১৫] তাঁর জীবনের ব্যাপক কর্মকান্ডের মধ্যে না গিয়ে শুধু মেয়েদের বিষয়ে তাঁর মনোভাব এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। যে সমাজ পরিবেশে মেয়েরা সর্বতোভাবে অবহেলিত সেখানে রামমোহনই প্রথম স্ত্রীজাতিকে স্বতন্ত্রভাবে মর্যাদা দেবার কথা ভেবেছিলেন, ''নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের মধ্যে দিয়ে নারীজাতি সম্বন্ধে তিনি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন।''[১৬] বিদেশিনী মহিলা মিস এইকিন রামমোহনকে বলেছিলেন,'The friend and champion of woman.'[১৭]

ধর্মের নামে মেয়েদের মৃত স্বামীর সঙ্গে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার মতো নৃশংস প্রথা ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে সহমরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই কু প্রথা নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজরা এদেশে আসবার পর থেকে। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী 'অন্দরে অন্তরে' গ্রন্থে সতীদাহ প্রথার সামাজিক ও মনস্তাত্বিক দিকগুলো নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন।[১৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় ১২৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সহমরণের বহু নিষ্ঠুর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[১৯] এই প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হলে সমাজের একাংশের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসতে থাকে। বাংলাদেশে ১৯১৫-১৯২৯ পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটির মতো সেই পরিপ্রেক্ষিতে সতীদাহ যে খুব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা বলা যায় না। নরবলি দেওয়াকে খুব ভয়ঙ্কর প্রথা বলে সমাজ মনে করলেও এবং লুকিয়ে চুরিয়ে তা করা হলেও মেয়েদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে সমাজ মনের কোনো বিবেক কাজ করে নি এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। রামমোহন রায়ের আগে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রচেষ্টা দেখা গেলেও তিনিই প্রথম পুরো সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই ইংরেজ সরকারী কর্মচারী এবং ধর্মযাজকেরা এই প্রথা রদ করার দাবী জানিয়ে আসছিল। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের ওলন্দাজ দিনেমার ও ফরাসী শাসকেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নিজেদের এলাকায় এই প্রথা বন্ধ করেছিল। শ্রীরামপুর মিশনের পাদরী উইলিয়াম কেরী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা বন্ধ করবার জন্য বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র থেকে সতীদাহ সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করে গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে পাঠিয়েছিলেন একথা বোঝানোর জন্যে যে হিন্দুশাস্ত্রে সতীদাহকে কোথাও আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয় নি। ১৮০৫ সালে ঘনশ্যাম শর্মা প্রমুখ ব্যক্তিরা এবং নিজামত আদালতের হিন্দু পন্ডিতেরা কেরীর এই বক্তব্য সমর্থন করেন। হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৮১৩ এবং ১৮১৭ সালে

নিজামত আদালতের বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে দেয়। নিজামত আদালতের ব্যবস্থা পত্র তৈরি করেছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। সেই ব্যবস্থা পত্রে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন সহমরণ অপরিহার্য নয়, ঐচ্ছিক মাত্র। বরং বেদান্তের মতে সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য পালনই তাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বহু প্রভাবশালী হিন্দুও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। সুতরাং রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই এদেশে সতীদাহ বিরোধী জনমত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সেই জনমতের চাপে সরকার এই কুপ্রথাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিল। তবু দেখা যায় ১৮১৮-১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা,বেনারস,বেরিলী এই সব জায়গায় ছশোরও বেশী সহমরণের ঘটনা ঘটেছিল।[২০]

রামমোহনের আগে বিচ্ছিন্নভাবে সতীদাহ প্রথা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করা হলেও তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে এই প্রথাকে বিলোপ করবার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারমূলক যে সব আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার বড় অংশ জুড়ে ছিল স্ত্রীজাতির দুঃখ দুর্দশা মোচনের চেষ্টা ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার। রামমোহন প্রথম সচেতনভাবে মেয়েদের দুর্দশা মোচনের জন্য শুধু যে সতীদাহ প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন তাই নয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বিষয়েও যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং মেয়েরা যাতে মর্যাদার অধিকারী হয় তারজন্যও সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ করবার জন্যে ইংরেজী ও বাংলায় পুস্তিকা রচনা করে তা প্রচার করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয়- প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তবকের সম্বাদ (১৮১৮), দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, তৃতীয় পুস্তিকা হল 'সহমরণ বিষয়ক'। এ ছাড়া ও ইংরেজিতে চারটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । তিনি শুধু পুস্তিকা লিখে ও প্রচার করে ক্ষান্ত হন নি । সতীদাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যবস্থা ঠিক মতো মানা হচ্ছে কি না তা দেখবার তদারকি সংস্থা গঠন করেছিলেন । নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে সদ্য বিধবাদের বুঝিয়ে সহমরণ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পত্রিকা সম্বাদ কৌমুদির (১৮১৯) মাধ্যমে সতীদাহ বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টা করেন, তাঁর এই আন্দোলনের ফলে হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন ওঠে । তাঁর বিরোধীরাও নানাভাবে রামমোহনকে আক্রমণ করতে শুরু করে । কিন্তু রামমোহনের নিরলস পরিশ্রমের ফলে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙের শাসন কালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। সহমরণ প্রথাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্পষ্টত দু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন, রাধাকান্তদেব রামকমল সেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিরা রামমোহনের তীব্র বিরধিতা করেছিলেন । দিলীপ কুমার বিশ্বাস 'রামমোহন সমীক্ষা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন 'সতীদাহ - উচ্ছেদ আইন পাশ হবার অনেক আগে থেকেই রামমোহন রায়ের মত কে আক্রমণ করে রক্ষণশীলদের পক্ষে একাধিক পন্ডিত পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।[২১] একটি চিঠিতে রাধাকান্ত দেব সতীদাহ প্রথার জন্য গর্ব অনুভব করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রথা অবলুপ্তির জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছেন । এর বিপরীত চিত্র ও আছে কলকাতার রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতার পাশাপাশি প্রগতিশীল নাগরিকবৃন্দ রামমোহনের আন্দোলনের সমর্থন করেছেন, তাঁকে প্রশংসা করে অভিনন্দন ও জানিয়েছেন ।

মেয়েদের দুর্দশা বিষয়ে রামমোহন কতখানি সজাগ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন তার প্রমাণ আছে সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ক পুস্তিকাগুলিতে । তিনি দেখিয়ে ছিলেন সেদিনকার সমাজে নারীর ভুমিকা কি ছিল । স্ত্রীজাতি সমাজে অবহেলার কোন অন্ধকারে পড়েছিল সেই নির্মম বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়।

" . . . আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটিতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায় । বিবাহের সময় 'স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষনাদি আপন ২ নিয়মিতকালে করে, ঐ রন্ধনে ও পরিবেষনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি ২ তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পুরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে, আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাহাদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুস্করিনী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে ২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরষ্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইলে তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টি গোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে, . . . আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপি কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই ২ পতি হস্তে আসিতে হয়, পতি ও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখনও বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে পর্যন্ত অধীন নানা দুঃখে দুঃখিনী তাহাবদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[২২] 'এই দীর্ঘ উদ্ধতিটি পড়লে বোঝা যায় রামমোহন কত গভীরভাবে স্ত্রীজাতির নিপীড়ন কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি এমন সব বর্ণনা দিয়েছেন যা আজও বাঙালি মেয়ের জীবনে অনেকাংশে সত্য । আধুনিক কালে নারী শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা থাকলেও বহু সাধারণ মেয়ের জীবন এই বর্ণনা অংশের বাইরে যেতে পারে নি।

সহমরণ প্রথার বিলোপ সাধনই মেয়েদের জন্য রামমোহন রয়ের একমাত্র কাজ নয়। মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার, ধর্মাচরণে স্বাধীনতা এবং বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে ও তিনি ভেবেছিলেন । প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে সময়ে হিন্দু পরিবারে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর কোনো আইনগত অধিকার ছিল না । সেই কারণে ১৮২২ সালে রামমোহন Brief Remarks Regarding mordern encrochments on the Ancient rights of Females নামে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ।[২৩] এখানেও শাস্ত্রীর প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে 'স্ত্রীলোকের দায়াধিকার' সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে যে প্রথা সে দিন প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কারণ প্রাচীন শাস্ত্রে মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্রের মতো স্ত্রীরও অধিকার আছে তবে তা শর্তসাপেক্ষ অধিকার । সুশীল কুমার দে রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন - And inspite of this enthuseasm for women's cause, we have no indication in this work of

any constructive views on widow remarriage, child marriage or women's educations.[২৪] এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় রামমোহনের কর্মের জগৎ ব্যাপক ও বিস্তৃত । সুতরাং শুধু মেয়েদের বিষয়ে মন নিবিষ্ট রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ঠিকই কিন্তু বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহ নিয়ে মাথা না ঘামালে ও স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মতামত ছিল অনেক স্বচ্ছ। স্ত্রী-শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা মনে করেই সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এক জায়গায় প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করেছিলেন; ''আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন।''[২৫] এই উক্তি থেকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তার মনোভাব বোঝা যায় । যদিও বাস্তবে এ বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তবে ধর্ম সাধনায় ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুল্য আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রামমোহন রায়ের পৌত্রী রাধাপ্রসাদ রায়ের জৈষ্ঠা কন্যা চন্দ্রজ্যোতি দেবী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, ''রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা গায়ত্রী জপ । তাঁর ছোট পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের স্ত্রী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য শ্লোকগুলির আওড়াতে ইদানিং আমরা নিজে কানে শুনেছি । গায়ত্রী জপও করতেন দ্রবময়ী দেবী রীতিমত । যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ,'রাজা এনেদিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে; ধর্ম সংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম ।[২৬] রামমোহন সহানুভুতি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন সমাজে মেয়েদের ভালভাবে বাঁচার অধিকার সুরক্ষিত হওয়া দরকার। তিনিই প্রথম মেয়েদের বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়ে পরবর্তীকালে এদেশে নারী সমাজের মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছিলেন । এই পথ ধরেই মেয়েদের নিয়ে নতুন ভাবনা নতুন সংস্কার কর্মসূচী নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

একেশ্বর বাদ প্রচার করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে চেয়ে রামমোহন সেই সময়ের বাঙালি সমাজকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিলেন । অন্যদিকে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে মাত্র তিন বছর ছিলেন। অল্পসময়ে এই তরুণ শিক্ষক অসামান্য চরিত্রগুণে ছাত্রদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছাত্রদের মনে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন। এই ডিরোজিয়ানরা মানবতাবাদ ও ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুজারী । ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের প্রভাবে নারী সম্পর্কে মনের মধ্যে নতুন ধরনের রোমান্টিক ভাবনার জন্ম হয়েছে ।

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টায় যে সময়ে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন সেই সময়েই ১৮১৯ সালে মিশনারিরা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে এদেশীয় মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । এ বিষয়ে তারা দেশীয় বিদ্যানুরাগী বেশ কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্য পান। এঁরা হলেন রাধাকান্তদেব কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পন্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার জোড়াসাঁকোর রাজ পরিবারের রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রভৃতি । 'স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক - অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের শিক্ষা দৃষ্টান্ত' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন।[২৭] ১৮২১ এ স্কুল সোসাইটির পক্ষ থেকে মিস কুক নামে একজন শিক্ষিত মহিলা স্ত্রী শিক্ষা দেবার জন্য এদেশে আসেন । তাঁর সাহায্যে প্রায় দশটা বিদ্যালয় স্থাপন করে ২৭৭জন মেয়েকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয় । এরপর ইংরেজ মহিলারা বেঙ্গল লেডিজ সোসাইটি স্থাপন করে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল খুলতে লাগলো। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এরজন্যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন । বেঙ্গল লেডিজ্ সোসাইটির সাহায্যে কলকাতা ছাড়াও শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা,

কাটোয়া। কৃষ্ণনগর ঢাকা বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বীরভুম প্রভৃতি স্থানে উনিশটা বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রায় সাড়ে চারশ বালিকার পড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্যালয় গুলোকে প্রধানত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর হত এবং সেখানকার ছাত্রীরাও সমাজের নিম্ন শ্রেণী থেকে আসত। এদের মধ্যে মিশনারীদের শিক্ষা কিছুটা প্রচার পেলেও সার্বিকভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের সকল শ্রেণীর যোগ হয় নি। ফলে এই প্রচেষ্টা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি।[২৮] এই সব বাধা দূর করে মেয়েদের জন্য যথার্থ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকারী শিক্ষা সংসদের সভাপতি মহামতি ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন এদেশে কয়েকজন উৎসাহী মানুষের সহায়তায় ১৮৪৯ সালে ৭মে কলকাতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যা বেথুন কলেজ বলে পরিচিত।[২৯] স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন নিয়ে সে সময়ে সমাজে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়ে ছিল । গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা বালিকাদের পড়াশোনা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রপ করতে ছাড়ে নি। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণ তন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত এবং সুকুমার মতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত । লোকে বলিতে লাগিল, এইবার কলির বাকী যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না। নাটুকে রাম নারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন, 'বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে আর কি রক্ষা আছে। এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে ?'লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া একগাল হাসিতে লাগিল।''[৩০] ইয়াং বেঙ্গল ও ব্রাহ্ম সমাজের আগ্রহে স্ত্রী শিক্ষা গুরুত্ব পেতে শুরু করে । পর্দা প্রথার কারণে রক্ষণশীলরা বাইরে বেরিয়ে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার বিরোধিতা করলেও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন । বাড়িতে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাঁদের আপত্তি ছিল না । মেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠিয়ে যাঁরা নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটালেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্ত্রী শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে যতই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করুন না কেন [৩১] তিনিও কিন্তু সম্পাদক হিসাবে তার সম্পাদিত পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর-এ মেয়েদের লেখা গুরুত্ব দিয়ে ছাপতেন এবং তার প্রসার কামনা করতেন । তিনি সংবাদ প্রভাকরে- এ (১৮১১-১৮৫৬) লেখেন ঃ ''আমরা পরমানন্দ- সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে 'চিত্তবিলাসিনী' নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এ দেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফল স্বরুপ এই গ্রন্থ . . . অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনী মন্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা ।''[৩২]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন রায়। সেই আন্দোলনকে সচল রেখেছিল ইয়াং বেঙ্গল গোষ্ঠী এবং সমাজের অগ্রণী শ্রেণী হিসেবে পরিচিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিরা। এই সংস্কার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে দারুণ ভাবে সক্রিয় ছিল সমাজের বৃহত্তর অংশ রক্ষণশীল সম্প্রদায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কি ছিল তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরকে রামমোহন রায়ের উত্তরসূরী হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। রামমোহন সতীদাহ রদ করবার জন্য আন্দোলন করে ছিলেন, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।[৩৩] কিন্তু দুজনের কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। সে যুগের মধ্যবিত্ত বাঙালিরা সমাজ সংস্কারের

নানা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। "উনিশ শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে ছিল দুটি স্বতন্ত্র ধারায় । তার একটি ছিল ধর্মসংস্কারের নামে সমাজ-সংস্কার । অন্যটি ছিল ধর্মের প্রশ্নকে বাইরে রেখে অথবা এড়িয়ে গিয়ে সমাজ-সংস্কার রামমোহন ছিলেন প্রথম ধারার প্রবর্তক । দ্বিতীয় ধারায় প্রবর্তক ছিলেন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র এবং সর্বপ্রধান চালিকা শক্তি।"[৩৪] রামমোহন যেমন একটা কালের প্রতিনিধি বিদ্যাসাগরও তেমন একটা সময়ে বঙ্গসমাজের 'অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী আদর্শ পুরুষরূপে' সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অনেক বিষয়ে। স্ত্রী লোকের দুর্দশা দূর করবার জন্য এই শতাব্দীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা গেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন কে কেন্দ্র করে। তবে বিদ্যাসাগরের অনেক আগে থেকেই বিধবা-বিবাহ দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে।১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন চালু হবার একশো বছর আগেই ঢাকার রাজা রাজবল্লভ নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সমাচার দর্পণ, জ্ঞানান্বেষণ, হরকরা, রিফর্মার, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বহু চিঠিপত্র ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ নিয়ে আন্দোলন শুরু করার এক যুগ আগে থেকেই মধ্য কলকাতায় নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামা চরণ দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্র লোক হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন । বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন । সাধারণ মানুষও তাঁকে নিয়ে গান ছড়া বেঁধেছিল।[৩৫] বিধবা বিবাহকে বিদ্যাসাগরের নিজের জীবনের প্রধান সৎকর্ম বলে মনে করেছিলেন । কিন্তু শিক্ষা - সংস্কারকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন নিজের জীবনের 'প্রিয়তম উদ্দেশ্য' বা 'darling object' বলে। এই প্রিয়তম উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে দিয়েই বিদ্যাসাগর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন ।[৩৬] বিদ্যাসাগরই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধারাবাহিক ভাবে স্ত্রী জাতির সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন এবং যতদূর সম্ভব প্রতিকার করবার চেষ্টা করেছিলেন । মেয়েদের জীবনে তাঁর অবদান কী সম্ভবত মেয়েরাও সে বিষয়ে সচেতন নয়। একজন অসামান্য মানুষের জীবনের অধিকাংশ কাজকর্ম মেয়েদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে । তাঁর প্রবাদ প্রতিম মাতৃভক্তি দিয়ে যা শুরু হয়ে মৃত্যুর আগে ইচ্ছাপত্র তৈরি মধ্য দিয়ে সে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাপত্রের বৈশিষ্ট্য হল নিকট ও দূর সম্পর্কের যত স্ত্রীলোক আছেন পুরুষ আত্মীয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্ত্রী আত্মীয়দের জন্যও মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন । বিদ্যাসাগরের সমাজ বিষয়ক রচনার অধিকাংশ মেয়েদের সমস্যা নিয়ে লেখা --- বাল্যবিবাহের দোষ (১৮৫০)বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব-- দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৫৫) বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না (১৮৭১) বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৭৩)বিধবা বিবাহ ও হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা বিষয়িনী (১৮৭৭, ১৮৮০) প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আরো চারখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন । দশটির মধ্যে মেয়েদের সমস্যা নিয়েই লেখা ছটি গ্রন্থ ।

বাংলা দেশে নবজাগরণের প্রসঙ্গ নিয়ে পরবর্তীকালে বহু বিতর্ক দেখা গেছে ; নবজাগরণের প্রকৃতি নিয়ে যত মত ভেদ থাকুক না কেন বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার আমাদের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তেমনটি আগে কখনও হয় নি। যে সংস্কার মুক্ত যুক্তিবোধ বুদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল জীবনের সর্বত্র । আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির এক প্রধান লক্ষণ হল স্ত্রী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ -- নতুন দৃষ্টিতে তাদের আবিস্কার। ইয়াং বেঙ্গল গ্রুপ বা মধুসূধন

দত্ত যে ভাবে মেয়েদের আবিষ্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে আলাদা । ইংরেজি শিক্ষিত নবযুবকেরা ইংরেজি কাব্য উপন্যাস পাঠ করে রোমান্টিক আবরণের মধ্যে দিয়ে স্ত্রী জাতিকে নতুন ভাবে দেখতে শুরু করেছিল। তাদের ভাবনায় সাধারনভাবে নারী সমাজ যতটা না ঠাঁই পেয়েছিল তার থেকেও বেশি করে সমশ্রেণীভুক্ত স্ত্রী লোকেরা রোমান্টিক কল্পনার মায়াজালে আচ্ছন্ন মানবী রূপে কল্পনাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এঁদের আদর্শ ছিল রোমান্টিক ইংরেজ কবিরা। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা থেকে নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করার প্রেরণা পেয়েছিলেন এমন মনে করার থেকে বরং বেশি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হল নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা মায়ের প্রতি অপরিসীম ভক্তি তাছাড়া অসামান্য চরিত্র ধর্মের অধিকারিনী মা ভগবতীদেবীর সাহচর্য এবং বিদ্যাসাগরের নিজের স্বভাবের অপার মমত্ববোধ তাঁকে স্ত্রী জাতির কল্যাণ সাধনায় ব্রতী করেছিল। সেই মমতা সেবা ভালোবাসার বিনিময়ে মেয়েরা সংসারের কাছে সমাজের কাছে যে অবিচার অবহেলা পায় বিদ্যাসাগর সে বিষয়ে সম্পুর্ণ সচেতন ছিলেন । রামমোহনের লেখায় মেয়েদের প্রতিদিনকার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে । বিদ্যসাগরও মর্মস্পশী ভাষায় তাঁর অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন ঃ ''হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর বলিতে পারি না ।''[৩৭]

বিধবাদের নিরুপায় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বিদ্যসাগর বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তকের শেষে ভারতবর্ষের মানবসমাজকে সম্বোধন করে বলেছেন ,'' অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সকল এ রূপ কলুষিত হইয়া গিয়েছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত।. . . তোমরা মনে কর পতি বিয়োগ হইলেই স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায় ।''[৩৮] 'হুতোমপ্যাঁচার নকশা'য় একটা গানের উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে বিধবাদের অবস্থা কোথায় নেমে গিয়েছিল। - ''আজব সহর কলকেতা / রাড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।''[৩৯] 'রাঁড়' শব্দের অর্থ বিধবা কিন্তু বারবণিতা বা বেশ্যা হিসেবে এই শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এথেকে বোঝা যাবে সমাজে বিধবাদের নৈতিক স্খলন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণের পরবর্তী পর্যায়ে বিধবা বিবাহ বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ সহবাস সম্মতি এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ধারাবাহিক সংস্কার কর্ম চালিয়ে যাবার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। এই সব প্রথা সমাজের বিশেষ অংশে প্রচলিত থাকলেও এরফলে সামাজিক দূষণের ভয়াবহতা কিছু কম ছিল না।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত পুথিগুলিতে যে শাস্ত্রীয় যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন তা অস্বীকার করবার মতো শক্তি সে যুগে আর কোনো পন্ডিতের ছিল না। বিধবাদের বিশেষ করে বালবিধবাদের অসহনীয় দুঃখ দুর্দশায় কাতর হয়ে এই হৃদয়বান মানুষটি শাস্ত্রীয় যুক্তি ঘেঁটে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বিধবাদেরও বিবাহ হয়। কর্তব্য মনে করে নয়, শাস্ত্রে প্রমাণ থাকলে তবেই হিন্দু সমাজের মাথারা মেনে নেবে নতুবা নয়। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগরের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া কন্যা কালীমতী দেবীকে বিবাহ করেন। এটাই প্রথম বিধবা বিবাহ। বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্র নিবারণচন্দ্রেরও বিধবা বিবাহ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তাঁর কর্মজীবন এবং মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। ''বিধবা বিবাহ - প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে

যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।. . . আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"[৪০] বিধবা বিবাহ ছাড়াও বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ , সহবাস সম্মতি এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। এই সমস্ত প্রথাই স্ত্রীলোকের উপর প্রযুক্ত অমানবিক প্রথা। বিদ্যাসাগরই প্রথম মেয়েদের উপর সবরকম সামাজিক অত্যাচারের প্রতিকার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কৌলীন্য প্রথার কুফল নিয়ে রামমোহন সর্বপ্রথম সরকার ও দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। সেই সময়কার সংবাদপত্রে এই বিষয় নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছিল। ১৮২২-১৮৭৩ পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। ১৮৫৫-৫৬ সালে আইন করে বিধবা বিবাহ চালু হওয়ায় বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিয়েও অনুরূপভাবে আইনের সহায়তা পাবার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বহুবিবাহ বিরোধী আবেদন পত্র সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে দেশে যে মহাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার দেশাচারের বিরোধিতা করে নতুন আইন প্রণয়ন করতে ভরসা পায়নি। আবার ১৮৬৬ সালে একুশ হাজার লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র বাংলায় ছোট লাট সার সিসিল বীডনের কাছে পেশ করা হয়। বিদ্যাসাগর নিজে কুলীনদের বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও এর কুফলের দিকগুলো নিয়ে দুটি পুস্তিকা লেখেন - 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' ১ম-১৮৭১, ২য়-১৮৭৩। সরকার পক্ষ থেকে এই নিয়ে একটা কমিশন গঠন করা হলেও কোনো আইন প্রণয়নের চেষ্টা করা হয় নি। সে যুগের অনেক রক্ষণশীল নেতা এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও এই আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন, যদিও তিনি বহুবিবাহ সমর্থন করতেন না। শিক্ষার প্রসার ও অন্যান্য কারণে কৌলীন্য প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। বাল্য বিবাহ নিয়েও বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেছিলেন। ব্রাহ্ম বিবাহের ক্ষেত্রে ১৮৭২ সালে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। হিন্দুদের মধ্যে তখনো বাল্য বিবাহ চালু ছিল। ব্রাহ্ম বিবাহের আইনের ধারাগুলো হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হোক বিদ্যাসাগরের তেমনই ইচ্ছা ছিল।[৪১] ১৮৯১ সালে আইন করে বারো বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সহবাস দন্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির নেতৃত্বে কলকাতায় বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। এতে বোঝা যায় হিন্দু সমাজের বড় অংশ রক্ষণশীলদের পক্ষে ছিল। এমন কি বিদ্যাসাগরও এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। বদরুদ্দীন উমর তাঁর বইতে বিষয়টাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ "উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মধ্যে রক্ষণশীলতার এই উত্থান ঐ শ্রেণীরই একজন হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিলো, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকেও যে পূর্বের তুলনায় অনেকখানি অস্বচ্ছ করে তুলেছিলো, তার সব থেকে বড় প্রমাণ সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কে ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে, অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে, তাঁর অভিমত। এ প্রসঙ্গে বাল্য বিবাহ প্রথা আইনের দ্বারা রহিত করার দাবী না জানিয়ে তিনি সরকারকে লিখেছিলেন," ... I should feel like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consumate marriage before his wife has had her first messes... such a law would not only serve the interests of humanity ... but would, so far from inter ferign with religious usage, enforce a rule laid down in the sastras." তিনিই বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে পূর্বে লেখনি ধারণ ও আন্দোলন সত্ত্বেও ১৮৯১ সালে ধর্মীয় আচার লঙঘন না করে

শাস্ত্র- সম্মত আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন।"[৪২] বিদ্যাসাগরের এই অভিমতকে তাঁর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সহবাস সম্মতি আইনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু একথা সত্য নয়। বাল্য বিবাহের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কে তাঁর স্ববিরোধী সুপারিশ 'উনিশ শতকে প্রতিক্রিয়ার উত্থানের মুখে তাঁর হতাশা ও পরাজয়ের অভিব্যক্তি মাত্র।'[৪৩]

বিধবা-বিবাহকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে মনে করতেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকার কথা মনে রাখলে বলতে হয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্ত্রী শিক্ষার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা। ". . . শিক্ষা বিভাগের নব-নিযুক্ত ডিরেকটার মিস্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন লইয়া ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলায় স্কুল ইনস্পেকটারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ও সুবিধা উপস্থিত।" [৪৪] কিন্তু সরকার স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য এই অর্থ ব্যয় করতে রাজী হল না। বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়ে এই কর্ম ত্যাগ করলেন। বেথুন স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে তিনি এই স্কুলের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। পাঠ্য তালিকায় কি কি বই পড়ানো হবে তার একটা নির্দিষ্ট সূচী তৈরি করেছিল। ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্য পুস্তকের কথা বলেন নি। বেথুন স্কুলে মেয়েরা অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ে উত্তম পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগের পাশাপাশি আরো অনেক বিদ্যালয় খুলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। কলকাতা, বারাসত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৮৬৩ সনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৫ টি। ছাত্রী সংখ্যা ১,১৮৩। ব্রাহ্ম সমাজের নেতারাও নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। মানুষের মুক্তির অন্যতম শর্ত বিদ্যাশিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গভীর বাস্তববোধে তা অনুধাবন করেছিলেন বলেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এত যত্ন পরিশ্রম ও আর্থিক দায় নিয়েছিলেন। চন্দ্রমুখী বসু মেয়েদের মধ্যে প্রথম এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিদ্যাসাগর আনন্দ প্রকাশ করে এক সেট শেক্সপীয়রের রচনাবলী উপহার দিয়ে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ বৎসে চন্দ্রমুখী সেদিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কাল হরণ কর এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমাভিব্যহারে যৎকিঞ্চিৎ উপহার (Shakespeare's work) প্রেরিত হইয়াছে। পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। কিমধিকমিতি ১০ অগ্রহায়ণ ১২১৯ সাল।"[৪৫] এই ছোট আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিটির মধ্যে লক্ষণীয় বিদ্যাসাগর এই উচ্চশিক্ষিত বঙ্গ কন্যার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন সে একই সঙ্গে 'স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী' হবে এবং 'সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন' ও হবে। একজন আধুনিক নারীর কাছে এর চেয়ে আর কি কাম্য হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

১. Renascent Bengal (1817- 1857)
[Proceedings of a seminar organised by The Asiatic Society, Calcutta] with a foreword by Ramesh Chandra Majumdar First published 1972 ' Social Change - Benoy Ghose P-20

২. রবীন্দ্র রচনাবলী/ একাদশ খন্ড/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ পৃষ্ঠা- ১৯৪

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত/ প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩/ ষষ্ঠ সং/ পৃষ্ঠা-২৯২

৪. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী/ অন্দরে অন্তরে - উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা/ স্ত্রী/ ১৯৯৫/ পৃষ্ঠা- ৪

৫. Dr. R.C.Majumdar/ Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century/ 1960/ P- 14

৬. Edited by R.C.Majumdar/ The History of Bengal Vo/ 1 (Hindu Period), Third impression - 1976/ 'Position of women' / P- 609

৭. অতুল সুর/ আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী/ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ পৃষ্ঠা- ৮৪-৮৫

৮. প্রসন্নময়ী দেবী/ পূর্বকথা/ প্রথম প্রকাশ ১৯১৭/ সুবর্ণরেখা সং ১৯৮২/ পৃষ্ঠা-৩

৯. বিনয় ঘোষ/ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র- ৩/ প্রথম প্রকাশ ১৯৮০

১০. Sushil Kumar De/ Bengali Literature in the nineteenth Century/ 1757-1857 /Firma K.L. Mukhopadhayay 1962 P-498-99

১১. শিবনাথ শাস্ত্রী/ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - নিউ এজ পাবলিশার্স -১৯৭৭-পৃষ্ঠা-৯১

১২. বদরুদ্দীন উমর/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ/ ভারতীয় সং - ১৯৮০-পৃষ্ঠা-২৬

১৩. তদেব

১৪. ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়/ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বির্বতন/ ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল/ সম্পাদনা মোহনলাল মিত্র -কানাইলাল মিত্র/ পৃষ্ঠা-২৫৯

১৫. বদরুদ্দীন উমর/ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ/ ভারতীয় সং ১৯৮০ পৃষ্ঠা- ২৪

১৬. ডঃ জ্ঞানেশ মৈত্র/ নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য/ ন্যাশানাল পাবলিশার্স -১৯৮৭

১৭. তদেব

১৮. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী/ অন্দরে অন্তরে/ স্ত্রী -১৯৯৫

১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত - সংবাদ পত্রে সেকালের কথা/ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-১ম,২য় প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯,১৩৪০

২০. ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়/ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন/ ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল/ সম্পাদনা- মোহনলাল মিত্র, কানাই লাল মিত্র/ যোগেশ চন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি - আলফা পাবলিশার্স কনসার্ন/পৃষ্ঠা- ২৫৯-৬০

২১. দিলীপ কুমার বিশ্বাস/ রামমোহন সমীক্ষা/ সারস্বত লাইব্রেরী- ১৯৮৩

২২. রামমোহন রচনাবলী -হরফ প্রকাশনী- ১৯৭৩- পৃষ্ঠা- ২০২- ৩

২৩. তদেব পৃষ্ঠা- ৪২৩

২৪. Sushil Kumar De/ Bengali Literature in the nineteenth Century/ Firma K.L. Mukhopadhayay 1962/ P-538

২৫. রামমোহন রচনাবলী - হরফ প্রকাশনী - ১৯৭৩- পৃষ্ঠা- ২০২

২৬. দিলীপ কুমার বিশ্বাস/ রামমোহন সমীক্ষা/ সারস্বত লাইব্রেরী- ১৯৮৩ পৃষ্ঠা- ১৮৯-৯০

২৭. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বঙ্গ সাহিত্যে নারী/ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ - ১৩৫৭ পৃষ্ঠা- ২

২৮. শিবনাথ শাস্ত্রী/ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/ নিউ এজ- ১৯৭৭ পৃষ্ঠা- ১৭২

২৯. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বঙ্গ সাহিত্যে নারী/ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ - ১৩৫৭ পৃষ্ঠা- ৪

৩০. শিবনাথ শাস্ত্রী/ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/ নিউ এজ- ১৯৭৭ পৃষ্ঠা- ১৭২

৩১. ঈশ্বর গুপ্ত- আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে।।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।

তখন এ.বি. শিখে বিবি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে।।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- পৃষ্ঠা- ৩০০

৩২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বঙ্গ সাহিত্যে নারী/ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ - ১৩৫৭ পৃষ্ঠা- ৪

৩৩. বদরুদ্দীন উমর/ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ/ ভারতীয় সং ১৯৮০ পৃষ্ঠা- ২৩

৩৪. তদেব পৃষ্ঠা- ২৩-২৪

৩৫. শিবনাথ শাস্ত্রী/ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/ নিউ এজ- ১৯৭৭

৩৬. বদরুদ্দীন উমর/ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ/ ভারতীয় সং ১৯৮০ পৃষ্ঠা- ৪৬

৩৭. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ - ২ - সমাজ/ সাক্ষরতা- ১৯৭২- পৃষ্ঠা- ১৫৬

৩৮. তদেব পৃষ্ঠা- ১৫৫

৩৯. কালীপ্রসন্ন/ সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা - সম্পাদনা অরুণ নাগ/ সুবর্নরেখা- ১৪০৩ পৃষ্ঠা- ১১৬

৪০. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ- ১ শিক্ষা ও বিবিধ/ সাক্ষরতা - ১৯৭৪- পরিশিষ্ট- পৃষ্ঠা- তেরো

৪১. চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বিদ্যাসাগরের জীবনী

৪২. বদরুদ্দীন উমর/ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ/ ভারতীয় সং ১৯৮০ পৃষ্ঠা- ৫৯

৪৩. তদেব পৃষ্ঠা- ৬১

৪৪. শিবনাথ শাস্ত্রী/ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/ নিউ এজ- ১৯৭৭ পৃষ্ঠা- ১৯১

৪৫. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ- ১ শিক্ষা ও বিবিধ/ সাক্ষরতা - ১৩৮১- পরিশিষ্ট- পৃষ্ঠা- চৌদ্দ

146167

(১৫)

14 MAR 2002